بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১ জানুয়ারি, ২০২১ মোতাবেক ১ সুলাহ্, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত আলী (রা.)-এর স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত আলী (রা.)'র শাহাদতের পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "বিষয়টি পুরোপুরি নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্বেই খারেজীরা পরামর্শ করে যে, যতজন জ্যেষ্ঠ (সাহাবী) রয়েছে, তাদেরকে হত্যা কর আর (তাদের ভাষ্যানুসারে) এভাবে এই নৈরাজ্যের অবসান ঘটাও। অতএব তাদের ধৃষ্টরা (অর্থাৎ, বাহাদুর বা দুঃসাহসীরা) এই অঙ্গীকার করে বের হয় যে, তাদের একজন হযরত আলী (রা.)-কে, একজন হযরত মুআবিয়া (রা.)-কে, এবং আরেকজন হযরত আমর বিন আল্ আস (রা.)-কে একই দিনে এবং একই সময়ে হত্যা করবে। যে ব্যক্তি হযরত মুআবিয়া (রা.)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে গিয়েছিল, সে হযরত মুআবিয়া (রা.)'র ওপর আক্রমন করলেও তার তরবারি যথাস্থানে আঘাত করতে পারে নি তাই হযরত মুআবিয়া (রা.) সামান্য আহত হন। সেই ব্যক্তি ধরা পড়ে আর পরবর্তীতে হত্যা করা হয়। যে ব্যক্তি হযরত আমর বিন আল্ আস (রা.)-কে হত্যা করতে গিয়েছিল, সে-ও ব্যর্থ হয়, কেননা তিনি অসুস্থতার কারণে (সেদিন) নামাযে আসেন নি। যে ব্যক্তি {তখন হযরত আমর বিন আল্ আস (রা.)'র স্থলে} তাদেরকে নামায পড়ানোর জন্য এসেছিল তাকে সে হত্যা করে আর নিজেও ধরা পড়ে এবং পরবর্তীতে নিহত হয়। যে ব্যক্তি হযরত আলী (রা.)-কে হত্যা করতে বের হয়েছিল, ফজরের নামাযের জন্য তিনি (রা.) যখন দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন, তখন সে তাঁর ওপর আক্রমন করে এবং তিনি গুরুতর আহত হন। তাঁর ওপর আক্রমণ করার সময় সেই ব্যক্তি এই শব্দাবলী উচ্চারণ করে যে, **হে আলী (রা.)! তোমার সব কথা মানতে হবে সেই অধিকার তোমার নেই বরং এই অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার**। **(আনওয়ারে খিলাফত, আনওয়ারুল উলূম, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২০২)**

মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)'র শাহাদতের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। হযরত উবায়দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বলেন, হে আলী! তুমি কি জান, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মাঝে সবচেয়ে হতভাগা ব্যক্তি কে? তিনি নিবেদন করেন, আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.) সবচেয়ে ভালো জানেন। তখন তিনি (সা.) বলেন, পূর্ববর্তীদের মাঝে সবচেয়ে হতভাগা ব্যক্তি ছিল হযরত সালেহ্ (আ.)-এর উটনীর পায়ের রগ কর্তনকারী ব্যক্তি। আর হে আলী! পরবর্তীদের মাঝে সবচেয়ে হতভাগা ব্যক্তি হবে সে, যে তোমার ওপর বর্শার আঘাত হানবে। এরপর তিনি (সা.) সেই স্থানের প্রতি ইঙ্গিত করেন যেখানে তাকে বর্শার আঘাত করা হবে।

হযরত আলী (রা.)'র দাসী উম্মে জা'ফর-এর বর্ণনা হল, আমি হযরত আলী (রা.)'র হাতে পানি ঢালছিলাম, এমন সময় তিনি (রা.) তার মাথা তুলেন এবং নিজের দাঁড়ি ধরে তা নাক পর্যন্ত উঁচু করেন, আর দাঁড়িকে সম্বোধন করে বলেন, বাহবা! তোমার মর্যাদা ঈর্ষণীয়, তুমি অবশ্যই রক্তে রঞ্জিত হবে। অতঃপর জুমুআর দিন তাকে শহীদ করা হয়।

হযরত আলী (রা.)'র শাহাদতের ঘটনা এক স্থানে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, ইবনে হানাফিয়্যাহ্ বর্ণনা করেন, আমি এবং হযরত হাসান (রা.) ও হযরত হোসেন (রা.) গোসলখানায় বসে ছিলাম। এমন সময় আমাদের কাছে ইবনে মুলজাম আসে। সে যখন প্রবেশ করে তখন হাসান-হোসেন উভয়ে তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন এবং বলেন, এভাবে এখানে আমাদের কাছে আসার দুঃসাহস তোমার কীভাবে হল? আমি তাদের উভয়কে বলি, তোমরা তার সাথে কথা বলো না। কসম খেয়ে বলছি, সে তোমাদের বিরুদ্ধে যা কিছু করার দুরভিসন্ধি রাখে, তা এর চেয়েও ভয়ানক। হযরত আলী (রা.)'র ওপর আক্রমণের পর ইবনে মুলজামকে বন্দি করে আনা হলে ইবনে হানফিয়্যাহ্

বলেন, আমি তো তাকে সেদিনই ভালোভাবে চিনে ফেলেছিলাম যেদিন সে গোসলখানায় আমাদের কাছে এসেছিল। তখন হযরত আলী (রা.) বলেন, সে বন্দি, তাই ভালোভাবে তাকে আপ্যায়ন কর এবং তাকে সম্মানের সাথে রাখ। আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে হয় তাকে হত্যা করব অথবা তাকে ক্ষমা করে দিব। আর আমি যদি মারা যাই তাহলে আমার হত্যার বদলে শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করবে, কিন্তু সীমালঙ্ঘন করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)'র মুক্ত ক্রীতদাস কুসাম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হযরত আলী (রা.) তাঁর ওসীয়্যতে আমার বড় পুত্রকে লিখেছেন যে, তার অর্থাৎ ইবনে মুলজামের পেট ও লজ্জাস্থানে যেন বর্শাঘাত না করা হয়। লোকেরা বর্ণনা করে, খারেজীদের মধ্য হতে তিনজনকে নিযুক্ত করা হয়েছিল, (অর্থাৎ) হিমইয়ার গোত্রের আব্দুর রহমান বিন মুলজাম মুরাদী, যে মুরাদ গোত্রভুক্ত গণ্য হতো, যারা কিন্দার বংশ বনু জাবালাহ্'র মিত্র ছিল আর বুরাক বিন আব্দুল্লাহ্ তামীমী এবং আমর বিন বুকায়ের তামীমী। এরা তিনজনই মক্কায় মিলিত হয় এবং দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় যে, সেই তিনজনকে অর্থাৎ হযরত আলী বিন আবু তালেব (রা.), হযরত মুআবিয়াহ্ বিন আবু সুফিয়ান (রা.) এবং হযরত আমর বিন আ'স (রা.)-কে তারা অবশ্যই হত্যা করবে; এবং মানুষকে তাদের (হাত) থেকে নিষ্কৃতি দিবে– যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ ছিল সেই তিনজন হন্তারকের নাম, যাদের ঘটনা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) শুরুতে বর্ণনা করেছিলেন। আব্দুর রহমান বিন মুলজাম বলে, আমি আলী বিন আবু তালেবকে হত্যা করার দায়িত্ব নিচ্ছি। বুরাক বলে, আমি মুয়াবিয়াহ্কে হত্যার দায়িত্ব নিচ্ছি। আর আমর বিন বুকায়ের বলে, আমি তোমাদেরকে আমর বিন আ'স এর (হাত) থেকে মুক্তি দিব। এরপর তারা একথায় দৃঢ় অঙ্গীকার করে আর পরস্পরকে নিশ্চয়তা যে, তারা নিজেদের নির্ধারিত ব্যক্তিকে হত্যা করার অঙ্গীকার থেকে পিছপা হবে না আর হত্যা করার জন্য যতদূর যেতে হয় তারা যাবে অর্থাৎ হয় হত্যা করবে অথবা এ লক্ষ্যে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিবে। অর্থাৎ, সেই তিনজনকে হয়তো হত্যা করবে বা প্রয়োজনে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিবে, কিন্তু (ব্যর্থ হয়ে) ফিরে আসবে না। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে এ কাজের জন্য ১৭ই রমযানের রাতকে নির্ধারণ করে। এরপর তারা প্রত্যেকে সেই শহর অভিমুখে যাত্রা করে যেখানে তার উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বসবাস করতেন, অর্থাৎ যাঁকে তার হত্যা করার কথা। আব্দুর রহমান বিন মুলজাম কুফায় আসে এবং তার খারেজী বন্ধুদের সাথে মিলিত হয়, কিন্তু তাদের কাছে সে নিজের অভিপ্রায় গোপন রাখে। সে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যেত আর তারাও তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসত। সে একদিন তাইমুর্ রিবাব গোত্রের কিছু লোককে দেখতে পায়, যাদের মধ্যে কাতাম বিনতে শিজনাহ্ বিন আদী নামের এক মহিলা ছিল। নাহরাওয়ানের যুদ্ধে হযরত আলী (রা.) তার পিতা ও ভাইকে হত্যা করেছিলেন। সেই মহিলাকে ইবনে মুলজামের মনে ধরে এবং সে তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। সে বলে, তুমি আমার সাথে একটি অঙ্গীকার না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে বিয়ে করব না। ইবনে মুলজাম বলে, তুমি যা চাইবে আমি তোমাকে তা-ই দিব। সে বলে, তিন হাজার এবং আলী বিন আবী তালেবকে হত্যা। (অর্থাৎ তিন হাজার দিরহাম দিতে হবে এবং আলী বিন আবু তালেবকে হত্যা করতে হবে।) সে বলে, আল্লাহ্র কসম! আমি তো আলী বিন আবু তালেবকে হত্যা করার মানসেই এই শহরে এসেছি। আমি তোমাকে অবশ্যই তা দিব যা তুমি চেয়েছ। এরপর ইবনে মুলজাম শাবীব বিন বাজারাহ্ আশজায়ী'র সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে নিজ সংকল্পের কথা জানায় আর তার সাথে থাকার জন্য বলে। শাবীব তার এই প্রস্তাবে সম্মত হয়। আব্দুর রহমান বিন মুলজাম সেই রাত, যার প্রভাতে বা পরের দিন সকালে সে হযরত আলী (রা.)-কে শহীদ করার সংকল্প করেছিল, **আশআস বিন কায়েস কিন্দীর** মসজিদে তার সাথে শলাপরামর্শ করে কাটায়। ফজরের কাছাকাছি সময় **আশআস** তাকে বলে, উঠো সকাল হয়ে গেছে। **আব্দুর রহমান বিন মুলজাম** এবং **শাবীব বিন বাজারাহ্** উঠে দাঁড়ায় এবং নিজেদের তরবারি নিয়ে সেই ফটকের বিপরীতে গিয়ে বসে পড়ে যেখান দিয়ে হযরত আলী (রা.) বাইরে বের হতেন। হযরত হাসান বিন আলী (রা.) বর্ণনা করেন, প্রত্যুষে আমি হযরত আলী (রা.)'র কাছে গিয়ে বসি। তখন হযরত

আলী (রা.) বলেন, **"সারারাত আমি আমার বাড়ির লোকদের জাগাতে থাকি, এরপর বসে বসেই আমার চোখ জুড়ে ঘুম নেমে আসে, তখন স্বপ্নে মহানবী (সা.)-কে দেখি। (হযরত আলী (রা.) বলছেন,) আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আমি আপনার উম্মতের পক্ষ থেকে বক্রতা এবং চরম বিতণ্ডার সম্মুখীন। তিনি (সা.) বলেন, তুমি তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া কর। আমি দোয়া করি, হে আল্লাহ্! আমাকে তাদের পরিবর্তে তা দান কর যা তাদের চেয়ে উত্তম। আর তাদের ওপর আমার পরিবর্তে এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত কর যে আমার চেয়ে নিকৃষ্ট।"** ইতিমধ্যে ইবনে নাব্বাহ্ মুয়াযি্যন এসে বলেন, নামাযের সময় হয়ে গেছে। হযরত হাসান (রা.) বলেন, আমি হযরত আলী (রা.)'র হাত ধরলে তিনি উঠে হাঁটতে আরম্ভ করেন। ইবনে নাব্বাহ্ তাঁর সামনে ছিলেন এবং আমি পিছনে। যখন তিনি (রা.) দরজা দিয়ে বাইরে বের হন, তখন তিনি ডেকে বলেন, হে লোক সকল! 'নামায নামায'। অর্থাৎ তিনি (রা.) নামাযের জন্য ডাকতেন এবং প্রতিদিনই এরূপ করতেন। যখন তিনি (রা.) বের হতেন তখন তার হাতে চাবুক থাকত এবং (তা দিয়ে) দরজায় আঘাত করে তিনি মানুষকে জাগাতেন। ঠিক সেই সময় উক্ত দুই আক্রমণকারী তাঁর (রা.) সামনে বেরিয়ে আসে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্য হতে কারো কারো বর্ণনা হল, আমি তরবারির ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাই এবং একজনকে একথা বলতে শুনি, **হে আলী! আদেশ দেয়ার অধিকার আল্লাহ্‌র তোমার না।** এরপর আমি দ্বিতীয় তরবারি দেখতে পাই। তরপর উভয়ে একযোগে আক্রমণ করে। আব্দুর রহমান বিন মুলজাম-এর তরবারির আঘাত লাগে হযরত আলী (রা.)'র কপাল থেকে নিয়ে মাথার উপরিভাগ পর্যন্ত এবং মগজ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। অপরদিকে শাবীবের তরবারি দরজার চৌকাঠে গিয়ে লাগে। আমি হযরত আলী (রা.)-কে এ কথা বলতে শুনি যে, এই ব্যক্তি যেন তোমাদের হাত থেকে পালাতে না পারে। মানুষ চতুর্দিক থেকে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিন্তু শাবীব পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অপরদিকে আব্দুর রহমান বিন মুলযামকে আটক করা হয় এবং তাকে হযরত আলী (রা.)'র নিকট পৌঁছে দেয়া হয়। হযরত আলী (রা.) বলেন, তাকে উত্তম খাবার খাওয়াও এবং নরম বিছানা প্রদান কর। আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে তার জীবন ভিক্ষা দেয়া বা প্রতিশোধ গ্রহণ করার বেশি অধিকার আমি রাখি। আর আমি যদি মারা যাই, তাহলে তাকেও হত্যা করে আমার সাথে মিলিত করে দিও। আমি জগতসমূহের প্রতিপালক প্রভুর নিকট তার সাথে বোঝাপড়া করব। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৫-২৭, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)**

অর্থাৎ, এরপর তিনি (রা.) এ বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লার সমীপে উপস্থাপন করবেন।

হযরত আলী (রা.)'র মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি ওসীয়্যত করেন এবং তাঁর ওসীয়্যত ছিল নিম্নরূপ-

"বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। এটি সেই ওসীয়্যত যা আলী বিন আবী তালিব করেছে। আলী ওসীয়্যত করছে, সে সাক্ষ্য দিচ্ছে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক-অনন্য এবং তাঁর কোন শরীক নেই। আর এ কথারও সাক্ষ্য দেয়, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল, যাকে আল্লাহ্ তা'লা হিদায়াত ও সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছিলেন, যেন তিনি এই ধর্ম (তথা ইসলামকে) অন্য সকল ধর্মমতের ওপর জয়যুক্ত করতে পারেন, মুশরিকরা তা যত অপছন্দই করুক না কেন। নিশ্চয় আমার নামায এবং আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ– সবই বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য। যার কোন শরীক নাই, আর আমাকে এরই আদেশ (বা শিক্ষা) দেয়া হয়েছে এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের একজন। এরপর তিনি (রা.) তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে বলেন, হে হাসান! আমি তোমাকে এবং আমার সকল সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত পরিবার-পরিজনদের সেই আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করার ওসীয়্যত করে যাচ্ছি, যিনি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক, এছাড়া তোমাদের মৃত্যু যেন আত্মসমর্পণকারীরূপে হয়। তোমরা সবাই মিলে আল্লাহ্ তা'লার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখবে এবং পরস্পর বিভক্ত হবে না, কেননা আমি আবুল কাসেম (সা.)-এর কাছে শুনেছি, পারস্পরিক সম্পর্কের সংশোধন ও উন্নয়ন সাধন নফল নামায ও রোযা অপেক্ষা উত্তম। (এটি অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা– নফল নামায ও রোযা অপেক্ষা শ্রেয়। অর্থাৎ পরস্পর সুসম্পর্ক বজায় রাখা ও সমঝোতা করা– এটি অনেক বড় পুণ্য।) তোমরা নিজেদের আত্মীয়স্বজনদের প্রতি যত্নবান থাকবে এবং তাদের সাথে সদাচরণ করবে, এতে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের হিসাব সহজ করে দিবেন। এতীমদের বিষয়ে আল্লাহ্কে ভয় করবে। তাদেরকে তোমাদের কাছে প্রকাশ্যে সাহায্য চাইতে বাধ্য করো না আবার তাদেরকে তোমাদের চোখের সামনে বিনষ্ট হয়ে যেতেও বাধ্য করো না। প্রতিবেশীদের বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করবে, কেননা এটি তোমাদের নবী (সা.)-এর ওসীয়্যত বা তাকীদপূর্ণ নির্দেশ। তিনি (সা.) সর্বদা প্রতিবেশীর অধিকার নিশ্চিত করার তাগাদা দিতে থাকেন; যার ফলে এক পর্যায়ে আমাদের ধারণা জন্মে, তিনি (সা.) হয়তো প্রতিবেশীদের উত্তরাধিকারী-ই ঘোষণা করে দিবেন! কুরআনের বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করবে। কুরআনের নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে অন্যরা যেন তোমাদের চেয়ে এগিয়ে না যায়। নামাযের বিষয়ে আল্লাহ্কে ভয় করবে, কেননা এটি তোমাদের ধর্মের মূল ভিত্তি। আপন প্রভুর গৃহ সম্পর্কে আল্লাহ্কে ভয় করবে এবং জীবনভর এটিকে খালি হতে দিবে না। কেননা এটিকে খালি ছেড়ে দেয়া হলে এর সমতুল্য কোন গৃহ তোমরা আর খুঁজে পাবে না। আর আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করবে এবং নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ করবে। যাকাতের বিষয়ে আল্লাহ্কে ভয় করবে। কেননা এটি আল্লাহ্র ক্রোধকে প্রশমিত করে। আর স্বীয় নবী (সা.)-এর প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্কে ভয় করবে। তোমাদের কেউ যেন অন্যের প্রতি অন্যায়-অবিচার না করে। আর তোমাদের নবী (সা.)-এর সাহাবীদের বিষয়ে আল্লাহ্কে ভয় করবে, কেননা মহানবী (সা.) তাদের বিষয়ে ওসীয়্যত করে গেছেন। আর দরিদ্র ও মিসকীনদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করবে এবং তাদেরকে তোমাদের জীবনোপকরণে অংশীদার করবে। আর তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করবে যারা তোমাদের অধীনস্থ অর্থাৎ যাদের দেখাশোনার দায়িত্ব তোমাদের ওপর অর্পিত হয়েছে– তাদের বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করবে। নামাযের সুরক্ষা করবে, নামাযের সুরক্ষা করবে। তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে কোন তিরস্কারকারীকে ভয় করবে না। (আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি সর্বাগ্রে থাকা উচিত, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।) খোদা তোমাদের জন্য সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথেষ্ট হবেন যে তোমাদের কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। আর মানুষের সাথে পুণ্যকথা বলবে যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। সৎকাজের নির্দেশ প্রদান ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করা কখনো পরিত্যাগ করবে না। নতুবা তোমাদের মাঝ থেকে মন্দ লোকেরা তোমাদের নেতা বনে বসবে। (অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নাহিয়ে আনিল মুনকার' অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং মন্দ কর্ম হতে বিরত রাখার কাজ সবসময় অব্যাহত রাখবে। এটিকে কখনো পরিত্যাগ করবে না। নতুবা তোমাদের মন্দ ব্যক্তিরাই তোমাদের হাকেম বা শাসক বনে বসবে।) এরপর তোমরা দোয়া করলেও তোমাদের দোয়া গৃহীত হবে না। (যা বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অবস্থা।) পারস্পরিক যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক বজায় রাখবে এবং সকল প্রকার কৃত্রিমতার ঊর্ধ্বে থেকে একে-অন্যের উপকার সাধন করবে। সাবধান! পারস্পরিক শত্রুতা বৃদ্ধি করবে না, সম্পর্কচ্ছেদ করবে না ও বিভেদে লিপ্ত হবে না আর পুণ্য ও তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহযোগিতা করবে, কিন্তু পাপ বা বিদ্রোহে সহযোগিতা করবে না। আল্লাহ্ তা'লার তাক্বওয়া অবলম্বন করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা কঠোর শাস্তিদাতা। হে আহলে বায়ত বা নবী-পরিবারের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ! আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের সুরক্ষা করুন এবং তোমাদের নবী (সা.)-কেও তোমাদের মাধ্যমে হিফাযত করুন। {অর্থাৎ তোমাদের উত্তম দৃষ্টান্তের মাধ্যমে মহানবী

(সা.) যেন সদা জীবিত থাকেন}। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র হাতে সঁপে যাচ্ছি এবং তোমাদের প্রতি সালাম ও আল্লাহ্‌র রহমত কামনা করছি।" **(তারীখুত্ তাবরী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৮, ৪০ হিজরী, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত)**

আবু সিনান বর্ণনা করেন, যখন হযরত আলী (রা.) আহত অবস্থায় ছিলেন তখন তিনি তাঁকে দেখতে যান। বর্ণনাকারী বলেন, আমি নিবেদন করি, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার এই আহত অবস্থা দেখে আমরা খুবই চিন্তিত। হযরত আলী (রা.) বলেন, কিন্তু খোদার কসম! আমি নিজেকে নিয়ে চিন্তিত নই; কেননা পরম সত্যবাদী ও সত্যায়িত আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আমাকে বলেছিলেন, তোমার শরীরের অমুক অমুক স্থান ক্ষতবিক্ষত হবে। এরপর তিনি (সা.) তাঁর কানপট্টি বা কপালের পার্শ্বদেশে ইঙ্গিত করে বলেন, তোমার এখান থেকে রক্ত ঝরবে, এমনকি তোমার দাড়ি রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে। আর এরূপ অপকর্মকারী এই উম্মতের সবচেয়ে দুর্ভাগা ব্যক্তি হবে যেভাবে উটনীর হাঁটুর রগ কর্তনকারী ব্যক্তি সামূদ জাতির সবচেয়ে হতভাগা ছিল। **{আল্ মুসতাদরেক আলাস্ সহীহাঈন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৭, কিতাবঃ মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্ যিকরে ইসলাম আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা.), হাদীস নংঃ ৪৬৪৮, দারুল্ ফিকর থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত}**

এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত আলী (রা.) তাঁর ঘাতক ইবনে মুলজাম সম্পর্কে বলেছিলেন, তাকে বসাও! যদি আমি মারা যাই তবে তাকে হত্যা করো। কিন্তু তার অঙ্গচ্ছেদ করো না। আর আমি যদি জীবিত থাকি তাহলে আমি স্বয়ং তার শাস্তি মওকুফ অথবা (শরীয়সম্মত) শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করবো। **(আল্ ইসতিয়া'ব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২১৯, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত)**

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "বিভিন্ন ইতিহাসে লেখা আছে, হযরত আলী (রা.)'র ওপর এক ব্যক্তি ছুরিকাঘাত করে এবং তাঁর পেট ফেড়ে ফেলে আর ঘাতক ধরা পড়ে।" যাহোক তিনি (রা.) লিখেছেন, পেট ফেড়ে ফেলে। মাথায়ও আঘাত লেগেছিল। হয়তো পেটেও আঘাত লেগে থাকবে, নয়তো তাঁর ধারণা এমনিই ছিল বা সাধারণ বাকধারা হিসেবে (মুসলেহ মওউদ একথা) বলে থাকবেন। যাহোক, অধিকাংশ বর্ণনায় মাথায় আঘাত পাওয়ার কথা পাওয়া যায়। ঘাতক ধরা পড়ে। "তখন সাহাবীরা তাঁকে (রা.) জিজ্ঞেস করেন, আমরা ঘাতকের সাথে কী আচরণ করব? তিনি (রা.) হযরত ইমাম হাসান (রা.)-কে ডেকে ওসীয়্যত করেন, যদি আমি মারা যাই তাহলে আমার প্রাণের বিনিময়ে তাকে বধ করবে। আর আমি যদি বেঁচে যাই তাহলে তাকে যেন হত্যা করা না হয়।" **(খুতবাতে মাহমুদ. ১৬তম খণ্ড, পৃঃ ৪২৮)**

আমর যী মুর বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) যখন তরবারীর আঘাতে আহত হন তখন আমি তাঁর সকাশে উপস্থিত হই। তিনি (রা.) মাথা ঢেকে রেখেছিলেন। আমি নিবেদন করি, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আমাকে আপনার ক্ষতস্থান দেখান। তিনি (রা.) ক্ষতস্থানের কাপড় খুলে ফেলেন। আমি (দেখে) বলি, সামান্য আঘাত, তেমন ভয়ের কিছু নেই। তিনি (রা.) বলেন, আমি তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছি। তখন তাঁর কন্যা উম্মে কুলসুম পর্দার আড়াল থেকে কেঁদে উঠেন। তিনি (রা.) তাকে বলেন, কান্না বন্ধ কর, কারণ আমি যা দেখছি, তুমি যদি তা দেখতে তাহলে কাঁদতে না। আমি নিবেদন করি, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কী দেখছেন? তিনি (রা.) বলেন, (আমি দেখছি,) এ হল ফিরিশ্‌তা ও নবীদের জামাত আর ইনি হলেন মহানবী (সা.)। অর্থাৎ আমি একটি দৃশ্য দেখছি, ফিরিশ্‌তা এবং নবীদের জামাত রয়েছে আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)ও সেখানে উপস্থিত আছেন। মহানবী (সা.) বলছেন,) হে আলী! আনন্দিত হও। কেননা তুমি যেদিকে যাচ্ছ, সেটি তা অপেক্ষা উত্তম যেখানে তুমি এখন আছো। এক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আলী (রা.) তাঁর ওসীয়্যত সম্পন্ন করার পর বলেন, আমি আপনাদের সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া

রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বলছি। এরপর তাঁর আত্মা পরলোকে পাড়ি দেয়া পর্যন্ত তিনি কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বৈ অন্য আর কিছুই বলেন নি। **{উসদুল গাবাহ্ লি-মা'রেফাতিস সাহাবাহ্ লি-ইবনে আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১১৪-১১৫, যিকর আলী বিন আবী তালিব (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

হযরত আলী বিন আবু তালেব (রা.) যখন মারা যান তখন হযরত হাসান বিন আলী (রা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেন, হে লোক সকল! আজ রাতে এমন এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে যে, পূর্বেও কেউ তাঁর চেয়ে অগ্রগামী হতে পারে নি, আর পরেও কেউ তাঁর সমমর্যাদায় উপনীত হতে পারবে না। মহানবী (সা.) যখন তাঁকে কোন যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করতেন তখন জিব্রাইল তাঁর ডান পাশে এবং মিকাইল তাঁর বাম পাশে থাকতো আর যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাঁর হাতে বিজয়ের মুকুট না দিতেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি প্রত্যাবর্তন করতেন না। তিনি কেবল ৭শ' দিরহাম রেখে গেছেন আর উক্ত অর্থ দ্বারা তাঁর গোলাম বা দাস ক্রয় করার ইচ্ছা ছিল। তাঁর আত্মা ঠিক সেই রাতে কবয করা হয়, যে রাতে হযরত ঈসা (আ.)-এর আত্মা তুলে নেয়া হয়েছিল অর্থাৎ পবিত্র রমযানের ২৭তম রাতে। অপর এক বর্ণনায় হযরত আলী (রা.)'র শাহাদতের সময় বর্ণনা করা হয়েছে ৪০ হিজরী সনের ১৭ই রমযানের রাতে। তাঁর (রা.) খিলাফতকাল ছিল চার বছর সাড়ে আট মাস। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৮, যিকর আলী ইবনে আবী তালিব (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {আল্ ইসাবাহ্ ফী তমীযিস্ সাহাবাহ্ লি-ইবনে হাজর আসকালানী , ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪২৮, যিকর আলী ইবনে আবী তালিব (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৫ সালে প্রকাশিত}**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনাটি (এভাবে) বর্ণনা করছেন, তাবকাত ইবনে সা'দ-এর তৃতীয় খণ্ডে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু (রা.)'র মৃত্যুকালীন ঘটনা হযরত হাসান (রা.)'র বরাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেন, হে লোকসকল! আজ সেই ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছেন যার কোন কোন শ্রেষ্ঠত্বে না পূর্ববর্তী কেউ উপনীত হয়েছে আর না পরবর্তী কেউ উপনীত হতে সক্ষম হবে। মহানবী (সা.) তাঁকে যখন যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করতেন, তখন জিব্রাইল তাঁর (আ.) ডান পাশে থাকতেন আর মিকাইল থাকতেন বাম পাশে। অতএব, তিনি বিজয় অর্জন না করে প্রত্যাবর্তন করতেন না। তিনি কেবলমাত্র ৭শ' দিরহাম পরিত্যাক্ত সম্পদ রেখে গেছেন এবং যা দিয়ে তিনি একজন গোলাম ক্রয়ের বাসনা রাখতেন। তিনি সেই রাতেই মৃত্যুবরণ করেছেন, যে রাতে হযরত ঈসা (আ.)'র আত্মা উর্ধ্বলোকে উন্নীত করা হয় অর্থাৎ রমযানের ২৭তম তারিখে। **(দাওয়াতুল আমীর, আনওয়ারুল উলূম, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৮)**

হযরত আলী (রা.)-কে তাঁর উভয় পুত্র এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন জা'ফর (জানাযার) গোসল দিয়েছিলেন। তাঁর (রা.) পুত্র হযরত হাসান (রা.) চার তকবীর দিয়ে তাঁর জানাযার নামায পড়ান। তাঁকে তিন (টুকরো) কাপড়ের কাফন পরানো হয়েছিল। যার মাঝে কামিজ (তথা জামা) ছিল না। সেহরীর সময় তাঁকে সমাহিত করা হয়। বলা হয়, হযরত আলী (রা.)'র কাছে তবারক হিসেবে পাওয়া কিছু কস্তুরী ছিল, যা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র শবদেহে লাগানোর পর অবশিষ্ঠ ছিল। আলী (রা.) ওসীয়্যত করেছিলেন যেন তাঁর (রা.) মৃতদেহেও এই কস্তুরী লাগানো হয়।

তাঁর বয়স নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে তাঁর বয়স ছিল ৫৭ বছর। আবার কারো কারো মতে তাঁর বয়স ছিল ৫৮ বছর। আবার কারো কারো মতে তিনি ৬৫ বছর আয়ু পেয়েছেন। কারো কারো মতে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। যদিও অধিকাংশের মতে ৬৩ বছর বয়স সংক্রান্ত বর্ণনাটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। **{উসদুল গাবাহ্ লি-মা'রেফাতিস সাহাবাহ্ লি-ইবনে আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১১৫, যিকর আলী বিন আবী তালিব (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

হযরত আলী (রা.)'র সমাধি কোথায়? তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। এ বিষয়ে ইতিহাসগ্রন্থে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়, যা নিম্নরূপ, হযরত আলী (রা.)-কে রাতের বেলা কূফায় সমাহিত করা হয়েছিল এবং তার দাফনের বিষয়টি গোপন রাখা হয়। হযরত আলী (রা.)-কে কূফার জামে মসজিদে দাফন করা হয়। হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেইন (রা.) হযরত আলীর (রা.) শবদেহ মদীনায় স্থানান্তরিত করেছিলেন এবং জান্নাতুল বাকীতে হযরত ফাতিমা (রা.)'র কবরের পাশে দাফন করেছিলেন। আরেকটি বিবরণ হল, যখন তারা দু'জন {অর্থাৎ হযরত হাসান ও হোসেইন

(রা.)} তার লাশ একটি সিন্দুকে ভরে উটের পিঠে রাখেন তখন সেই উটটি হারিয়ে যায় এবং সেই উঠকে তাঈ গোত্র আটক করে। প্রথমে তারা সিন্দুককে (মুল্যবান কোন) ধনসম্পদ মনে করে কিন্তু যখন দেখলো সিন্দুকে লাশ রয়েছে যা তারা চিনতে পারেনি তখন সিন্দুকেভরা লাশ দাফন করে ফেলে; আর কেউ জানে না যে আলী (রা.)'র কবর কোথায়। এরপর আরেক বর্ণনা অনুসারে, হযরত হাসান আলী (রা.)-কে কূফায় জা'দাহ্ বিন হুবায়রাহ্'র বংশধরদের কোন কক্ষে দাফন করেছিলেন। বলা হয়, জা'দাহ্ হযরত আলী (রা.)'র ভাগ্নে ছিল।

ইমাম জা'ফর সাদেক (রাহে.) বলেন, হযরত আলীর (রা.)'র জানাযা রাতের বেলা পড়া হয়েছে এবং কূফায় তাঁকে সমাহিত করা হয়। কিন্তু তাঁর করস্থানকে গোপন রাখা হয়, অবশ্য সেটি প্রশাসক বা আমীরের প্রাসাদের নিকটেই ছিল। অপর একটি বর্ণনানুসারে হযরত আলী (রা.)'র মৃত্যুর পর ইমাম হাসান (রা.) তাঁর জানাযা পড়ান এবং কূফার বাইরে তাঁকে দাফন করা হয়। আর খারেজীরা প্রমুখরা হযরত আলী (রা.)'র কবরের অসম্মান করতে পারে এই আশংকায় তাঁর কবরের স্থানটিকে গোপন রাখা হয়। কিছু শিয়া বলে থাকে, হযরত আলীর (রা.)-র কবর নাজাফ-এ অবস্থিত, যে স্থানটিকে বর্তমানে **'মাশহাদুন নাজাফ'** বলা হয়। একটি বর্ণনানুসারে কূফায় হযরত আলী (রা.)-কে শহীদ করা হয়েছিল কিন্তু তাঁর কবর কোথায় তা জানা নেই। হযরত আলীর (রা.)'র মৃত্যুর পর ইমাম হাসান (রা.) তাঁর জানাযা পড়ান এবং কূফার রাজধানীতে তাঁকে দাফন করা হয় এ আশংকায় যে, খারেজীরা আবার তাঁর লাশের অসম্মান না করে বসে।

আল্লামা ইবনে আসীর লিখেন, এটি প্রসিদ্ধ বিবরণ। আর যে এ কথা বলেছে, তার লাশ একটি পশুর (পিঠে) ওপর রাখা হয়েছে আর সে পশুটি তাঁর লাশ নিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেছে তা কেউ জানতে পারেনি! এটি সঠিক নয়। সে এ বিষয়ে অতিশয়োক্তি করেছে, এ বিষয়ে তার কোন জ্ঞান নেই আর বিবেক এবং শরীয়ত এর বৈধতার সাক্ষ্য দেয় না। আর যেসব অজ্ঞ রাফেযী এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, হযরত আলী (রা.)'র মাজার **'মাশহাদুন নাজাফ'এ** রয়েছে, এ বক্তব্যের পক্ষে কোন দলিল নেই আর না এর মাঝে কোন সত্যতা রয়েছে। বরং বলা হয়, সেখানে হযরত মুগীরা বিন শো'বার (রা.)'র কবর রয়েছে। **(আল্ বিদায়াহ্ ওয়ান্ নিহায়াহ্, ৪র্থ খণ্ড, ৭ম অংশ, পৃ: ৩১৬-৩১৭, সিফাতু মাকতালিহি রাযিআল্লাহু আনহু, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত), (তারীখে তাবরী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৭, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত)**

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ্ বলেন, নাজাফে মাশহাদ নামক স্থান সম্পর্কে আলেমরা একমত যে, এটি হযরত আলীর (রা.) কবরের স্থান নয়; বরং এটি হযরত মুগীরা বিন শো'বার (রা.) সমাধি। আহলে বায়ত, শিয়া এবং অন্যান্য মুসলমানরাও কূফায় তাদের ক্ষমতাসীন থাকা এবং তিনশ' বছরের অধিককাল অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কখনো এ কথা বলেন নি যে, এটি হযরত আলীর (রা.)'র কবর। হযরত আলী (রা.)'র শাহাদতের তিনশ' বছর পর এই জায়গার নাম দেয়া হয়েছে **'মাশহাদে আলী'**। তাই এই বিবরণ একেবারেই ভ্রান্ত যে, এটি হযরত আলী (রা.)'র কবর। **(এনসাইক্লোপিডিয়া সীরাত সাহাবায়ে কেরাম (রা.), ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩৬, সৈয়্যদনা আলী বিন আবী তালিব (রা.), রিয়াদের দারুস্ সালাম থেকে ১৪৩৮ হিজরীতে প্রকাশিত)**

এছাড়া আল্লামা ইবনে জওযী তার ইতিহাস-গ্রন্থে হযরত আলী (রা.)'র সমাধি সম্পর্কে বিভিন্ন বিবরণের উল্লেখ করেছেন যা ওপরেও বর্ণনা করা হয়েছে; অতঃপর তিনি বলেন, وَاللهُ اَعْلَمُ اَیُّ الْاَقْوَالِ। অর্থাৎ, কোন্ উক্তিটি বেশি যুক্তিযুক্ত ও সঠিক– তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। **(আল্ মুনতাযিম, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৭৮, ৪০ সন, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১২ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আলী (রা.)'র বিয়েশাদী এবং সন্তানসন্ততি সম্পর্কে এভাবে জানা যায়, তিনি (রা.) বিভিন্ন সময়ে মোট ৮টি বিয়ে করেন। যাদের নাম হল, ১) হযরত ফাতেমা বিনতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) ২) খওলা বিনতে জা'ফর বিন কায়েস ৩) লায়লা বিনতে মাসউদ বিন খালিদ ৪) উম্মুল বানীন বিনতে হিযাম বিন খালিদ ৫) আসমা বিনতে উমাইস ৬) সাবহা উম্মে হাবীব বিনতে রবীয়াহ্ ৭) উমামা বিনতে আবুল আ'স বিন রবী'। ইনি মহানবী (সা.)-এর কন্যা

সাহেবযাদী হযরত যয়নব (রা.)'র কন্যা এবং মহানবী (সা.)-এর দৌহিত্রী ছিলেন। ৮) উম্মে সাঈদ বিনতে উরওয়াহ্ বিন মাসঊদ সাকাফী। এই স্ত্রীদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা তাকে অনেক সন্তানসন্ততি দান করেন যার সংখ্যা ৩০-এর অধিক। এর মধ্যে ১৪জন ছেলে এবং ১৯জন মেয়ে। তাঁর বংশধারা হযরত হাসান (রা.), হযরত হোসেইন (রা.), মুহাম্মদ বিন হানাফিয়্যাহ্, আব্বাস বিন কিলাবিয়াহ্ এবং আমর বিন তাগলাবিয়্যাহ্'র মাধ্যমে বহাল থাকে। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ:১৪, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত), {ড. আলী মুহাম্মদ সালাবী অনুদিত সৈয়্যদনা আলী বিন আবী তালিব, পৃ: ৮২-৮৩, পাকিস্তানের মুযাফ্ফরগড়স্থ আল্ ফুরকান ট্রাস্ট খান গড় কর্তৃক প্রকাশিত)**

হযরত আলী (রা.)'র শ্রেষ্ঠত্ব, চরিত্র ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)'র বরাতে লেখা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ، فَلْيَأْتِ الْبَابَ। অর্থাৎ আমি জ্ঞানের শহর আর আলী এর দরজা। কেউ যদি এই শহরে প্রবেশ করতে চায় তাহলে তার এর দরজার আসা উচিত। **(আল্ মুসতাদরেক আলাস্ সহীহাঈন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৯, কিতাব মা'রিফাতিস্ সাহাবাহ্, যিকরু ইসলামী আমীরুল্ মু'মিনীন আলী (রা.), হাদীস নং: ৪৬৯৫, দারুল্ ফিকর থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত)**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, হযরত আলী (রা.) একবার বলেছেন, সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বীর এবং সাহসী ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)। অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, বদরের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.)-এর জন্য যখন পৃথক একটি উঁচুস্থান প্রস্তুত করা হয় তখন সবার মাঝে এ প্রশ্ন জাগে, আজ মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তার দায়িত্ব কার ওপর ন্যস্ত করা হবে? পরক্ষণেই হযরত আবু বকর (রা.) উন্মুক্ত তরবারি হাতে দণ্ডায়মান হন এবং এহেন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে তিনি পরম বীরত্বের সাথে তাঁর (সা.) নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন। একইভাবে হাদীসে এসেছে, একবার মহানবী (সা.) বলেন, أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا অর্থাৎ আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী হল এর দরজা। অতএব, মহানবী (সা.) স্বয়ং হযরত আলী (রা.)-কে জ্ঞানীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু খায়বরের যুদ্ধে সবচেয়ে কঠিন সময়ে তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)'র হাতেই ইসলামের পতাকা তুলে দিয়েছিলেন যা থেকে বুঝা যায়, মহানবী (সা.)-এর যুগে আলেমগণ ভীরু ছিলেন না বরং সর্বাধিক সাহসী ছিলেন। **(তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৪-৩৬৫)**

আলেমদের বীরত্বের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি {অর্থাৎ, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)} এ ঘটনার উল্লেখ করেন।

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, এমন এক যুগ অতিবাহিত হয়েছে যখন আমি ক্ষুধার যন্ত্রণায় পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম অথচ বর্তমানে আমার সদকা তথা যাকাতের পরিমাণ চার হাজার দীনারে গিয়ে পৌঁছেছে। আরেক বর্ণনায় চল্লিশ হাজার দীনারের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবু বাহার তার এক শিক্ষকের বরাতে বর্ণনা করেন, আমি হযরত আলী (রা.)-কে মোটা পায়জামা পরিধান করতে দেখেছি। তিনি বলেন, আমি এটি পাঁচ দিরহাম মূল্যে কিনেছি আর যে আমাকে এক দিরহাম মুনাফা দিবে তার কাছে আমি এটি বিক্রয় করবো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত আলী (রা.)'র কাছে সামান্য কিছু দিরহামের থলে দেখেছি তখন তিনি (রা.) বলেন, এটি আমাদের ভরণপোষণের জন্য যা **ইয়ামবু**'র সম্পত্তি থেকে সাশ্রয়কৃত। **ইয়ামবু** হল মদীনা থেকে ৭ মঞ্জিল দূরত্বে অবস্থিত সমুদ্র তিরবর্তী একটি (গ্রাম)। হযরত আলী (রা.)'র আংটির ওপর **আল্লাহুল মালিক** খোদাইকৃত ছিল যার অর্থ হল, **আল্লাহ্ই বাদশাহ্ বা সর্বাধিপতি**।

{উসদুল গাবাহ্ লি-মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্ লি-ইবনে আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৯৭, যিকর আলী বিন আবী তালিব (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}, {আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ:২২, যিকরু আলী বিন আবী তালিব (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, (লুগাতুল হাদীস, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৩, লাহোরের নু'মানী কিতাব খানা থেকে ২০০৫ সালে প্রকাশিত)

জুমায়ে' বিন উমায়ের বর্ণনা করেন, আমি আমার ফুপুর সাথে হযরত আয়েশা (রা.)'র কাছে যাই তখন তিনি (অর্থাৎ ফুপু) জিজ্ঞেস করেন, মানুষের মাঝে মহানবী (সা.)-এর সবচেয়ে প্রিয় কে ছিলেন? হযরত আয়েশা (রা.)

বলেন, হযরত ফাতেমা (রা.)। অতঃপর জিজ্ঞেস করেন, পুরুষদের মাঝে কে? তিনি (রা.) বলেন, তাঁর স্বামী হযরত আলী (রা.)। **(সুনান আত্ তিরমিযী, কিতাবুল মানাকেব, বাবু মা জায়া ফী ফাযলি ফাতিমাতা রাযিআল্লাহু আনহা, হাদীস নং: ৩৮৭৪)**

হযরত সা'লাবাহ্ বিন আবু মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, প্রত্যেক রণক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) পতাকা বহন করতেন কিন্তু যখনই যুদ্ধের সময় হতো তখন হযরত আলী বিন আবু তালেব (রা.) উক্ত পতাকা হাতে তুলে নিতেন। **{উসদুল গাবাহ্ লি-মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্ লি-ইবনে আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৯৩, যিকর আলী বিন আবী তালিব (রা.), বৈরুতের দারুল ফিকর থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

সাকীফ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) আমাকে 'সাবূর' অঞ্চলের কর্মকর্তা বা গভর্নর নিযুক্ত করেন। 'সাবূর' পারস্যের একটি অঞ্চল যা 'শিরায' হতে প্রায় ৭৫ মাইল দূরে অবস্থিত। {হযরত আলী (রা.) আমাকে নির্দেশ দিয়ে} বলেন, 'কাউকে এক দিরহাম করের জন্য চাবুক মারবে না আর মানুষের রিয্ক– এ হাত দেবে না আর শীতগ্রীষ্মে তাদের কাপড়ের পেছনেও ছুটবে না। অর্থাৎ, এমনভাবে কর আদায় করবে না, যাতে তারা বিবস্ত্র হয়ে যাবে আর তাদের কাছে এমন কোন প্রাণীও চাইবে না যা তারা নিজেদের (দৈনন্দিন) কাজে ব্যবহার করে। কাউকে এক দিরহামের জন্য দাঁড় করিয়ে রাখবে না। অর্থাৎ যে করই আদায় করতে হয় বা জিযিয়া আদায় করতে হয় করবে কিন্তু এজন্য কাউকে কোনরূপ কষ্ট দিবে না, (কারো ওপর) বোঝা চাপাবে না। আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! তাহলে তো আমি আপনার কাছে সেভাবেই ফিরে আসবো যেভাবে এখন যাচ্ছি অর্থাৎ কিছুই পাওয়া যাবে না। হযরত আলী (রা.) বলেন, তোমার কল্যাণ হোক। হ্যাঁ, তুমি যদি রিক্ত হস্তেও ফিরে আস তাতে কোন সমস্যা নেই আমাদেরকে কেবল মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত তথা উদ্বৃত্ত সম্পদ হতে কর আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। **{উসদুল গাবাহ্ লি-মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্ লি-ইবনে আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৯৮, যিকর আলী বিন আবী তালিব (রা.), বৈরুতের দারুল ফিকর থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}, (মু'জিমুল বুলদান, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮৮)**

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বলেছেন, **'তুমি আমার ভাই এবং আমার সঙ্গী'। (কনযুল উম্মাল, ১৩তম খণ্ড, পৃ: ১০৯, হাদীস নং: ৩৬৩৫৬, ফাযায়েলু আলী, মু'আসাসাতুর রিসালাহ্ কর্তৃক ১৯৮১ সালে প্রকাশিত)**

আলী বিন রবীয়াহ্ বর্ণনা করেন, আমি হযরত আলী (রা.)'র কাছেই উপস্থিত ছিলাম যখন তাঁর আরোহণের জন্য একটি বাহন আনা হয় । তিনি (রা.) রিকাবে পা রাখার সময় তিনবার বিসমিল্লাহ্ বলেন। আর তিনি (রা.) বাহনের পিঠে সোজা হয়ে বসার পর বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্। এরপর বলেন, سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (সূরা আয্ যুখ্রুফ: ১৪-১৫) অর্থাৎ পবিত্র সেই সত্তা যিনি এটিকে আমাদের অধীনস্ত করেছেন অথচ আমরা এর কোন ক্ষমতাই রাখতাম না আর নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের প্রভুর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবো। এরপর তিনি তিনবার আলহামদুলিল্লাহ্ এবং তিনবার আল্লাহু আকবার বলেন। এরপর তিনি এই দোয়া পাঠ করেন, سُبْحَانَكَ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ অর্থাৎ তুমি পবিত্র, নিঃসন্দেহে আমিই আমার প্রাণের প্রতি অবিচার করেছি, অতএব আমাকে ক্ষমা করে দাও কেননা, তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না। এরপর তিনি (রা.) মুচকি হাসেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি নিবেদন করি, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি হাসলেন কেন? তিনি (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে এমনটিই করতে দেখেছিলাম যেমনটি আমি করেছি ; এরপর তিনি (সা.) মুচকি হেসেছিলেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, এরপর আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আপনি কেন হাসলেন? উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, নিশ্চয় তোমার প্রভু তাঁর বান্দার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হন যখন সে বলে, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার পাপ ক্ষমা করে দাও আর নিঃসন্দেহে তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না। একথায় মহানবী (সা.) মুচকি হেসেছিলেন। **(জামে' তিরমিযী, আবওয়াবুদ্ দাওয়াত, বাব মা ইয়াকূলু ইয়া রাকিবা দাব্বাতান, হাদীস নং: ৩৪৪৬)**

ইয়াহইয়া বিন ইয়া'মুর বর্ণনা করেন, একবার হযরত আলী বিন আবু তালেব (রা.) বক্তৃতা প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর তিনি (রা.) বলেন, হে লোকসকল! তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি শুধুমাত্র বিভিন্ন পাপে নিমজ্জিত হওয়ার কারণে ধ্বংস হয়েছে। তাদের পুণ্যবান লোকেরা এবং আলেম-উলামা তাদেরকে এমনটি করতে করতে বারণ করতো না। এরপর তারা যখন পাপের ক্ষেত্রে সীমাতিক্রম করে, তখন বিভিন্ন ধরনের শাস্তি তাদেরকে ক্লিষ্ট করে। কাজেই, তোমাদের ওপরও তাদের মত শাস্তি আপতিত হওয়ার পুর্বেই তোমরা পুণ্যের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখ। স্মরণ রেখো, পুণ্যের নসীহত করা এবং পাপ থেকে বিরত রাখা তোমাদের জীবিকাও হ্রাস করবে না আর তোমাদের মৃত্যুকেও ত্বরান্বিত করবে না। **(তফসীরুল কুরআনিল আযীম লি-ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩২, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত)**

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, একবার আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে এক আনসারী মহিলার বাড়িতে ছিলাম, যিনি মহানবী (সা.)-এর জন্য খাবার প্রস্তুত করেছিলেন অর্থাৎ দাওয়াত দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন, এখন তোমাদের কাছে একজন জান্নাতী ব্যক্তি আসবে। এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) আসেন, আমরা তাকে অভিনন্দন জানাই। পুনরায় তিনি (সা.) বলেন, তোমাদের কাছে এক জান্নাতী ব্যক্তি আসবে, তখন হযরত উমর (রা.) আসেন; আমরা তাকেও অভিনন্দন জানাই। এরপর তৃতীয়বার তিনি (সা.) বলেন, এখন তোমাদের কাছে এক জান্নাতী ব্যক্তি আসবে, বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখলাম তখন মহানবী (সা.) তাঁর মাথা খেজুরের একটি ছোট চারাগাছের পেছনে আড়াল করে রেখেছিলেন আর বলছিলেন, হে আল্লাহ্! তুমি যদি চাও তাহলে আগমনকারী ব্যক্তি যেন আলীই হয়। অতঃপর হযরত আলী (রা.) প্রবেশ করেন আর আমরা তাকেও অভিনন্দন জানাই। **{মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১০৭, মুসনাদ জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.), হাদীস নংঃ ১৪৬০৪, বৈরুতের আলেমুল্ কুতুব থেকে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, জান্নাত তিন ব্যক্তির জন্য সাগ্রহে অপেক্ষমান আর তারা হলেন, হযরত আলী (রা.), আম্মার (রা.) এবং সালমান (রা.)। **{আল্ মুসতাদরেক আলাস্ সহীহাঈন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৮, কিতাবঃ মা'রিফাতিস্ সাহাবাহ্, যিকরু ইসলামী আমীরুল্ মু'মিনীন আলী (রা.), হাদীস নংঃ ৪৭২৪, দারুল্ ফিকর থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত}**

আবু উসমান নাহদী বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) বলেছেন, একদা মহানবী (সা.) আমার হাত ধরে রেখেছিলেন আর আমরা মদীনার একটি গলি অতিক্রম করে একটি বাগানের কাছে পৌঁছি। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এই বাগান কতই না মনোরম! তিনি (সা.) বলেন, **'তোমার জন্য জান্নাতে এর চেয়েও সুন্দর বাগান রয়েছে।'** **{আল্ মুসতাদরেক আলাস্ সহীহাঈন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৯, কিতাবঃ মা'রিফাতিস্ সাহাবাহ্, যিকরু ইসলামী আমীরুল্ মু'মিনীন আলী (রা.), হাদীস নংঃ ৪৭৩০, দারুল্ ফিকর থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত}**

হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত আলী (রা.)-কে সম্বোধন করে মহানবী (সা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, **'হে আলী! আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে এমন একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যার চেয়ে উত্তম গুণ তিনি তাঁর বান্দাদের দান করেন নি, আর তা হল জগতবিমুখতা**। আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে এমন বানিয়েছেন যে, তুমি জগত থেকে কিছু নাও না আর জগতও তোমার কাছ থেকে কিছু নেয় না অর্থ্যাৎ জগত বা জাগতিক বিষয়াদির তোমার কোন আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা নেই আর জগতপূজারীরাও তোমার সাথে কোনরূপ সম্পর্ক রাখতে চায় না। উপরন্তু আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে মিসকীনদের (অসহায়দের) ভালোবাসা দান করেছেন, তারা তোমাকে তাদের ইমাম বানিয়ে আনন্দিত আর তুমিও তাদেরকে তোমার অনুসারী (হিসেবে) পেয়ে আনন্দিত। অতএব তার জন্য সুসংবাদ! যে তোমাকে ভালোবাসে, এবং তোমার সম্পর্কে সত্য কথা বলে। আর ধ্বংস সেই ব্যক্তির জন্য, যে তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তোমার সম্পর্কে মিথ্যা বলে। যারা তোমার প্রতি ভালোবাসা রাখে এবং তোমার সম্পর্কে সত্য কথা বলে, তারা জান্নাতে তোমার বাড়ির প্রতিবেশী হবে এবং তোমার প্রাসাদে তোমার সঙ্গী হবে। আর যারা তোমার প্রতি

বিদ্বেষ পোষণ করে আর তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, (তাদের বিষয়ে) আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এই দায়িত্ব নিয়ে রেখেছেন যে, কিয়ামত দিবসে তিনি তাদেরকে চরম মিথ্যাবাদীদের দাঁড়ানোর স্থানে দাঁড় করাবেন'। **{উসদুল গাবাহ্ লি-মা'রেফাতিস সাহাবাহ্ লি-ইবনে আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৯৬-৯৭, যিকর আলী বিন আবী তালিব (রা.), বৈরুতের দারুল ফিকর থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'জান্নাতের যে স্তরে আমি থাকবো সে স্তরে আলী (রা.) এবং ফাতেমা (রা.)ও থাকবে'**। **(বারকাতে খিলাফত, আনওয়ারুল উলূম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৪)**

হযরত আলী (রা.)'র 'আশারা মুবাশ্শারা'য় অন্তর্ভুক্ত থাকার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আলী (রা.) আশারা মুবাশ্শারা অর্থাৎ সেই দশজন সৌভাগ্যবান সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত যারা এই পৃথিবীতেই মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখে জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছেন। হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি নয়জন সম্পর্কে এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা জান্নাতী। আর আমি যদি দশম ব্যক্তি সম্পর্কেও একথা বলি, অর্থাৎ সাক্ষ্য প্রদান করি তাহলে আমি গুনাহগার হবো না। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, সেটা কীভাবে? তিনি বলেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে হেরা পর্বতে ছিলাম, (হঠাৎ) সেটি কাঁপতে শুরু করে। তখন তিনি (সা.) বলেন, হে হেরা! স্থির হয়ে যাও। নিশ্চয়ই তোমার বুকে কোন নবী বা সিদ্দীক অথবা শহীদ দাঁড়িয়ে আছে। কেউ একজন প্রশ্ন করে, সেই দশ জান্নাতী ব্যক্তি কে কে? হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) স্বয়ং, আবু বকর (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.), আলী (রা.), তালহা (রা.), যুবায়ের (রা.), সা'দ (রা.) এবং আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)। জিজ্ঞেস করা হয়, দশম ব্যক্তি কে? তখন সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) বলেন, সেই ব্যক্তি আমি। **(সুনান আত্ তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকেব, বাবু মানাকেব আবীল আওর ওয়াসমুহু সাঈদ বিন যায়েদ, হাদীস নং: ৩৭৫৭)**

এখন যে ঘটনাটি বর্ণনা করতে যাচ্ছি, তা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু নিজের রিপুকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ও অহমিকা বা আমিত্বকে দূর করা প্রসঙ্গে এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন, এজন্য এটি পুনরায় এস্থলে উল্লেখ করছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

তিনি (রা.) বলেন, "হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহাহু এক শত্রুর সাথে লড়াই করছিলেন এবং কেবল খোদা তা'লার খাতিরেই লড়ছিলেন। অবশেষে হযরত আলী (রা.) তাকে ধরাশায়ী করেন এবং তার বুকে চড়ে বসেন, তখন সে চট করে হযরত আলী (রা.)'র মুখে থুথু নিক্ষেপ করে। তিনি (রা.) তৎক্ষণাৎ তার বুকের ওপর থেকে নেমে যান এবং তাকে ছেড়ে দেন। এ কারণে (ছেড়ে দেন) যে, এতক্ষণ পর্যন্ত তো আমি শুধুমাত্র খোদার খাতিরে তোমার সাথে লড়াই করছিলাম। কিন্তু এখন যেহেতু তুমি আমার মুখে থুথু দিয়েছ, তাই এখন আমার প্রবৃত্তিরও কিছুটা অংশ এতে যুক্ত হয়ে গেছে। কাজেই, আমি রিপু বা প্রবৃত্তির বশে তোমাকে হত্যা করতে চাই না। এথেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি (রা.) নিজের ব্যক্তিগত শত্রুকে শত্রু মনে করেন নি। {তিনি (আ.) জামাতকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,) নিজের মাঝে এরূপ স্বভাব ও অভ্যাস সৃষ্টি করা উচিত। যদি ব্যক্তিগত লোভ বা ব্যক্তি স্বার্থের জন্য কাউকে দুঃখ দেয় এবং শত্রুতার গণ্ডি প্রসারিত করে, তাহলে খোদা তা'লাকে অসন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে এর চেয়ে গুরুতর বিষয় আর কী হবে?" **(মলফূযাত, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১০৫)**

অপর একস্থলে তিনি (আ.) এই বিষয়ের ওপর আরও বিস্তারিত আলোকপাত করেন। তিনি (আ.) বলেন, "প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও ঐশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হযরত আলী (রা.)-এর একটি ঘটনা থেকে শিক্ষা নাও। লেখা আছে, এক কাফির পালোয়ানের সাথে হযরত আলী (রা.)'র যুদ্ধ হয়; বারবার তিনি (রা.) তাকে ধরাশায়ী করার চেষ্টা করেন, কিন্তু সে তার হাত ফসকে বেঁচে যায়। অবশেষে যখন তাকে ধরে ভালোভাবে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন ও তার বুকের ওপর চড়ে বসেন এবং ছুরি দিয়ে তার ভবলীলা সাঙ্গ করতে উদ্যত হন, তখন সে নিচে থেকে তাঁর (রা.) মুখে থুথু নিক্ষেপ করে। সে যখন এমন কাজ করে বসে, তখন হযরত আলী (রা.) তার বুক থেকে উঠে দাঁড়ান এবং তাকে ছেড়ে দেন ও (তার থেকে) দূরে সরে যান। এতে সে বিস্মিত হয় এবং হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করে, আপনি এত কষ্ট করে আমাকে ধরলেন, আর আমি আপনার প্রাণের শত্রু এবং আপনার

রক্তপিপাসু। কিন্তু এভাবে বাগে পেয়েও আপনি আমাকে ছেড়ে দিলেন! ব্যাপার কী?' হযরত আলী (রা.) উত্তরে বলেন, ব্যাপারটি হল, তোমার সাথে আমার কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। যেহেতু তুমি ধর্মীয় বিরোধের কারণে মুসলমানদের কষ্ট দাও, তাই তুমি হত্যাযোগ্য; আর আমি কেবল ধর্মীয় প্রয়োজনে তোমার সাথে লড়ছিলাম। কিন্তু তুমি যখন আমার মুখে থুথু দিলে তাই এ কারণে আমার রাগ ধরে, তখন আমি ভাবলাম, এখন ব্যক্তিগত বিষয় মাঝে এসে গেছে, এখন তাকে কিছু বলা সঙ্গত নয়; যাতে আমাদের কোন কাজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে না হয়। যা-ই করি, তা সবই যেন আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে করি। যখন আমার এই অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং এই ক্রোধ প্রশমিত হবে, তখন তোমার সাথে পুনরায় সেই আচরণই করা হবে। একথা শুনে সেই কাফিরের মনে এমন প্রভাব পড়ে যে, তার মন থেকে সব কুফরী দূরীভূত হয়ে যায় এবং সে ভাবে, পৃথিবীতে এই ধর্মের চেয়ে ভালো আর কোন ধর্ম হতে পারে, যার শিক্ষার প্রভাবে মানুষ এমন পবিত্র সত্তায় পরিণত হয়? তাই সে তখনই তওবা করে মুসলমান হয়ে যায়।" **(মলফূযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২১৯)**

অতএব, এটি হল প্রকৃত তাক্বওয়া- যা ফলাফলও প্রকাশ করে থাকে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'ও এই ইহুদীর সাথে হযরত আলী (রা.)'র লড়াইয়ের ঘটনাটি মোটামুটি অনুরূপভাবেই বর্ণনা করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, হযরত আলী (রা.) এক যুদ্ধে লড়াই করছিলেন। একজন অনেক বড় শত্রু, যার মোকাবিলা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুব কম মানুষ-ই করতে পারতো, হযরত আলী (রা.)'র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় (সে) এগিয়ে আসে এবং কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত তাঁর ও সেই ইহুদী পালোয়ানের মধ্যে লড়াই চলতে থাকে। অবশেষে কয়েক ঘন্টা লড়াইয়ের পর তিনি (রা.) সেই ইহুদীকে পরাভূত করেন এবং তার বুকের ওপর চেপে বসে খঞ্জর দিয়ে তার গলা কেটে ফেলার সংকল্প করেন। এমন সময় সেই ইহুদী অকস্মাৎ তাঁর মুখে থুথু দেয়। তিনি (রা.) সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে যান। এতে সেই ইহুদী অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলে, এ তো অদ্ভুত বিষয়! কয়েক ঘন্টার যুদ্ধের পর আপনি আমাকে পরাস্ত করলেন আর এখন হঠাৎ করেই আমাকে ছেড়ে পৃথক হয়ে গেলেন, এটি আপনি কী ধরণের বোকামি করলেন? হযরত আলী (রা.) উত্তরে বলেন, আমি কোন বোকামি করি নি, বরং আমি যখন তোমাকে পরাস্ত করি আর তুমি আমার মুখে থুথু নিক্ষেপ করলে তখন হঠাৎ করেই আমার রাগ ধরে যে, সে আমার মুখে থুথু দিলো কেন? কিন্তু পরক্ষণেই আমি ভাবলাম, এতক্ষণ আমি যা কিছু করছিলাম তা খোদার জন্য করছিলাম কিন্তু এরপরও যদি আমি লড়াই চালিয়ে যাই তাহলে তোমার মৃত্যু হবে আমার নিজের ব্যক্তিগত ক্রোধের কারণে। অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) বলেন, সেই ইহুদীকে হত্যা করা আমার ব্যক্তিগত ক্রোধের জন্যও হতে পারে, খোদার সন্তুষ্টির জন্য হবে না। তাই এখন তোমাকে ছেড়ে দেয়াই আমি সঙ্গত মনে করলাম। রাগ প্রশমিত হলে পুনরায় আমি তোমাকে পরাস্ত করব। **(আহমদীয়াত দুনিয়া মেঁ ইসলামী তা'লীম ও তমদ্দুন... আনওয়ারুল উলূম, ১৬তম খণ্ড, পৃ: ১৩২)**

বাকি আলোচনা আগামীতে হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি আরো একটি কথা বলতে চাই। আজ নববর্ষের প্রথম দিন এবং প্রথম জুমুআ। (আপনারা) দোয়া করুন– এ বছরটি যেন জামা'তের জন্য, পৃথিবীর জন্য এবং মানবতার জন্য কল্যাণকর হয়। আমরাও যেন আমাদের দায়িত্ব পালন করে পূর্বের তুলনায় বেশি খোদা তা'লার প্রতি সিজদাবনত হই এবং নিজেদের ইবাদতের মান বৃদ্ধি করি। এছাড়া জগদ্বাসীও যেন নিজেদের জন্মের (মূল) উদ্দেশ্য অনুধাবন করে আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য প্রদানকারী হয় এবং পরস্পরের প্রাপ্য অধিকার পদদলিত করার পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুসরণের মাধ্যমে পরস্পরের অধিকার প্রদানকারী হয়ে যায়। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় রীতি অনুসারে জগদ্বাসীকে তাদের দায়িত্বাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন। হায়! আমরা নিজেরা এবং পৃথিবীর সকল মানুষ যদি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপলব্ধি করে নিজেদের ইহলোক ও পরলোককে সুসজ্জিত ও সুনিশ্চিৎ করতে পারতাম।

গত এক বছর যাবৎ আমরা এক ভয়ঙ্কর মহামারীর মুখোমুখি আর পৃথিবীর কোন দেশই এই মহামারী থেকে মুক্ত নয়। কোথাও একটু কম আর কোথাও বেশি কিন্তু মনে হয় পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এদিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চায় না যে, কোথাও এই মহামারী আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আমাদের দায়িত্ব কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করানোর জন্য আসে নি তো? এটি ভাবতে চায় না। এমন তো নয় যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের আলোড়িত-আন্দোলিত করতে চান, (কিছু) বলতে চান এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। এদিকে কারো চিন্তা নেই।

কয়েক মাস পূর্বে আমি অনেকগুলো (দেশের) সরকার প্রধানকে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে পত্র লিখেছিলাম আর কোভিড-এর বরাতে বুঝানোর চেষ্টা করেছিলাম এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে, এসব দুর্যোগ আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আমাদের দায়-দায়িত্ব ভুলে যাওয়ার ফলে এবং তা পালন না করার কারণে বরং অন্যায়-অবিচারে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার কারণে এসে থাকে; তাই এদিকে দৃষ্টি দিন। কোন কোন রাষ্ট্রপ্রধান উত্তরও দিয়েছেন, কিন্তু তাদের উত্তর ছিল, আমরাও এটিই চাই {অর্থাৎ জাগতিক ধ্যান-ধারণাপ্রসূত উত্তর ছিল। (জাগতমুখি কথা বলেছে) ধর্মমুখি কথা বলে নি। তাতে (অর্থাৎ আমার পত্রে) অনেক বড় একটি অংশ যে খোদা সংক্রান্ত ছিল এর উল্লেখই করে নি।} (তারা বলেছে,) অবশ্যই এমন হওয়া উচিত, কিন্তু এসব লোক তাদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য ব্যবহারিক পদক্ষেপ নিতে চায় না আর জাতির প্রতি সহমর্মি হয়ে জাতিকে সত্যিকার লক্ষ্যের প্রতি মনোযোগীও করতে চায় না। অথচ তারা জানে এই মহামারী পরবর্তী পরিণাম খুবই ভয়ানক হবে। এ বিষয়টি পৃথিবীর প্রত্যেক নেতা, প্রত্যেক বিচক্ষণ মানুষ এবং প্রত্যেক বিশ্লেষক অবগত আছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সঠিক সমাধানের প্রতি (এদের) কোন দৃষ্টি নেই, কেবল জাগতিক চেষ্টাপ্রচেষ্টাতেই তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ।

এই রোগের ফলে প্রত্যেক আক্রান্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে প্রভাবিত তো হচ্ছেই কিন্তু মোটের ওপর অর্থনৈতিকভাবেও প্রভাবিত হচ্ছে বরং বড় বড় সম্পদশালী রাষ্ট্রের অর্থনীতিও পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। জগদ্বাসীর কাছে এর শধুমাত্র একটিই সমাধান রয়েছে যে, যখন এরূপ অবস্থা দেখা দিবে অর্থাৎ যখন অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে তখন অন্যান্য ছোট ছোট দেশগুলোর অর্থনীতির ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তাদেরকে কোনভাবে নিজেদের জালে ফাঁসাতে হবে, নিজেদের ফাঁদে ফেলতে হবে আর বিভিন্ন অজুহাতে তাদের সম্পদ করতলগত করতে হবে। এর জন্য ব্লক তৈরী হবে আর তা হচ্ছেও। পুনরায় শীতল যুদ্ধ শুরু হবে আর এখন তো বলা হচ্ছে, এক প্রকার শুরু হয়েই গিয়েছে। আর অসম্ভব নয় যে, অস্ত্রের যুদ্ধও হবে আর যা হবে চরম বিভীষিকাপূর্ণ যুদ্ধ। তখন এরা আরো একটি গভীর কুঁপে নিপতিত হবে। দরিদ্র দেশগুলো তো পূর্বেই পিষ্ট, কিন্তু এখন ধনী দেশগুলোর জনসাধারণও পিষ্ট হবে আর খুবই মারাত্মকভাবে পিষ্ট হবে।

তাই পৃথিবী এমন অবস্থায় পৌঁছানোর পূর্বেই আমাদের নিজেদের দায়িত্ব পালন করে জগদ্বাসীকে সতর্ক করা উচিত। অতএব এই বছর মোবারকবাদ বা শুভেচ্ছা জানানোর বছর বলে তখনই পরিগণিত হবে যখন আমরা আমাদের দায়িত্বাবলি এই আঙ্গিকে পালন করব অর্থাৎ মানুষকে বুঝাবো, জগদ্বাসীকে বুঝাব। আর এটি সুস্পষ্ট যে, এসব কিছু করার জন্য আমাদের নিজেদের অবস্থাও খতিয়ে দেখতে হবে। আমরা যারা যুগের ইমাম প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীকে মেনেছি, আমাদের নিজেদের অবস্থা কি এরূপ হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য প্রদানের পাশাপাশি কেবল তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর বান্দাদের প্রাপ্য অধিকারও প্রদান করছি নাকি এখনো আত্মসংশোধন এবং পারস্পরিক প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসার আবেগ অনুভূতিকে এক অসাধারণ মানে উপনীত করা বাকী আছে? তাই প্রত্যেক আহমদীর প্রণিধান করা উচিত, কেননা তার ওপর অনেক বড় দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে আর সেটি সম্পাদন করার জন্য সর্বপ্রথম নিজের মাঝে অর্থাৎ আহমদী সমাজে প্রেমপ্রীতি, ভালোবাসা ও ভাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করুন, এরপর বিশ্ববাসীকে সেই পতাকাতলে সমবেত করুন যা হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমুন্নত করেছেন আর যা আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের পতাকা। (এরূপ করলে) তবেই আমরা আমাদের বয়আতের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারব,

তখনই আমরা বয়আতের দায়িত্ব পালনকারী বলে সাব্যস্ত হব, তখনই আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপার উত্তরাধিকারী বলে গণ্য হব আর তখনই আমরা নতুন বছরের শুভেচ্ছা আদান প্রদানের যোগ্য হতে পারব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন আর প্রত্যেক আহমদী নরনারী, আবালবৃদ্ধবনিতা এই বিষয়টি অনুধাবন করে এই অঙ্গীকার করুন যে, এই বছর আমাকে পৃথিবীতে এক বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে নিজের সমস্ত যোগ্যতা ও সামর্থ্য ব্যয় করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে এর তৌফিক দান করুন।

বর্তমানে আমি পাকিস্তান ও আলজেরিয়ার আহমদীদের জন্য দোয়ার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাদেরকে আপনারা নিজেদের দোয়ায় স্মরণ রাখুন। পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে কতক মোল্লা এবং সরকারী কর্মকর্তারা অত্যাচার-নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা সংশোধনের অযোগ্য এমন লোকদের অতিসত্তর পাকড়া বা ধৃত করার ব্যবস্থা করুন। আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন কাদের সংশোধন হবে আর কাদের হবে না। যাদের সংশোধন হওয়ার নয় তাদের শীঘ্র পাকড়াও করার ব্যবস্থা করুন। রসূল অবমাননার যে আইনের অধীনে এসব লোক আহমদীদের ওপর অত্যাচার করার চেষ্টা করছে এবং আহমদীদের নিজস্ব শিক্ষাদীক্ষার জন্য যেসব মাধ্যম রয়েছে এমন প্রত্যেক মাধ্যমের ওপর তারা নিষেধাজ্ঞা আরোপের চেষ্টা করছে, আল্লাহ্ তা'লা এ অন্যায়কে দ্রুত তাদের ওপর থেকে দূর করে দিন আর আমাদেরকে তাদের খপ্পর থেকে মুক্তি দিন। প্রকৃতপক্ষে এরাই **'রহমাতুল্লিল আলামীন'** নামের দুর্নাম করছে আর আহমদীরা তো মহানবী (সা.)-এর সম্মান রক্ষায় নিজেদের জীবন উৎসর্গকারী। আজ পৃথিবীকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত করার কাজ বরং প্রকৃত কাজ সবচেয়ে বেশি আহমদীরাই করছে বরং বলা উচিত প্রকৃত কাজ কেউ যদি করে থাকে তবে আহমদীরাই করছে।

অতএব, এই জগতপূজারীরা রাষ্ট্রক্ষমতা ও সম্পদের অহমিকায় আমাদের ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন করতে পারে ঠিকই কিন্তু (তাদের) একথা স্মরণ রাখা উচিত! আমরা সেই আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখি যিনি 'নে'মাল মওলা ওয়া নে'মান নাসীর' অর্থাৎ, সেই খোদা যিনি সর্বোত্তম অভিভাবক এবং সর্বোত্তম সাহায্যকারী, নিশ্চিতভাবে তাঁর সাহায্য এসে থাকে এবং অবশ্যই আসে। আর যখন আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন আসে তখন এসব জগতপূজারী এবং যারা নিজেদের শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর মনে করে তাদের কোন নাম-চিহ্নও অবশিষ্ট থাকে না। কাজেই আমাদের দায়িত্ব হল, দোয়ার মাধ্যমে আমাদের ইবাদতকে প্রাণবন্ত করা আর যদি আমরা এরূপ করতে সক্ষম হই তাহলেই আমরা সফলকাম।

আলজেরিয়ার ব্যাপারে আমি (আপনাদের) বলেছিলাম, সবাইকে কারামুক্ত করে দিয়েছে। (আসলে) সেখানে একটি আদালত সবাইকে মুক্তি দিয়েছে এবং আরেকটিও সামান্য কিছু জরিমানা করে প্রায় সবাইকে মুক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু এখনও সেখানে কিছু আহমদী কারাবন্দী জীবন কাটাচ্ছেন। আপনারা তাদের জন্যও দোয়া করুন যেন তাদেরও অবিলম্বে মুক্তির উপকরণ সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের কারাবন্দীদের মুক্তির জন্যও দোয়া করুন। আমাদের আনন্দ নববর্ষের হোক কিংবা ঈদের, প্রকৃত আনন্দ তো তখন হবে যখন আমরা পৃথিবীর সর্বত্র আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের পতাকা উড্ডীনকারী হবো, যা নিয়ে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছিলেন। (সত্যিকার) আনন্দ তখন হবে যখন মানুষ মানবিক মূল্যবোধ অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। যখন পারস্পরিক ঘৃণাসমূহ ভালোবাসায় রূপান্তরিত হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে অবিলম্বে এই আনন্দের উপকরণ দান করুন। মুসলিম উম্মাকেও আল্লাহ্ সুবুদ্ধি দিন যেন তারা আগত প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আ.)-কে মানতে পারে। আর জগদ্বাসীকেও বিবেকবুদ্ধি দান করুন, যেন তারা আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগী হয়। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক দেশের সকল আহমদীকে স্বীয় নিরাপত্তা ও সুরক্ষার চাদরে আবৃত করে রাখুন। আর এ বছরটি প্রত্যেক আহমদী ও প্রতিটি মানুষের জন্য কৃপা ও কল্যাণের বছর হোক। বিগত বছরগুলোতে আমাদের দ্বারা যেসব দুর্বলতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির কারণ হয়েছে কিংবা আমাদেরকে কোন কোন পুরস্কার থেকে

বঞ্চিত রাখার কারণ হয়েছে, এসব কিছু থেকে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে রক্ষা করুন এবং আমাদেরকে স্বীয় পুরস্কার ও কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী করুন এবং আমরা যেন প্রকৃত মু'মিন হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এসব দোয়া করারও তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২ জানুয়ারি, ২০২১, পৃঃ ৫-১১)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)